বাংলার ছোটগল্প

ষষ্ঠ খণ্ড

সম্পাদনা
ড. বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ
৯এ নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা ঃ ষষ্ঠ খণ্ড

ষষ্ঠ খণ্ড শুরু হয়েছে এ-কালের বিশিষ্ট কথাশিল্পী প্রফুল্ল রায়ের 'রাজা যায় রাজা আসে'-র মতো অসামান্য গল্প দিয়ে। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ছে তাঁর 'মূকাভিনেতা', 'চর', 'ভোজ', 'মাঝি', 'নিশিগন্ধা', 'বাঁচার জন্যে', 'চারিদিকে কুয়াশা', 'বাঘ', 'মৃত্যুর আগে এবং পরে' গল্পগুলির কথা।

অন্যান্যদের মধ্যে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'দূরত্ব', 'মুনিয়ার চারদিক', 'প্রিয় মধুবন', 'শেষবেলায়', 'উড়োজাহাজ', 'স্বপ্নের ভেতরে মৃত্যু', 'তোমার উদ্দেশ্যে', 'ভুল', 'প্রতীক্ষার ঘর', 'পটুয়া নিবারণ', 'অমিয়া', 'আমাকে দেখুন' গল্পগুলির কথা তো ভোলার নয়। দেবেশ রায়ের 'কয়েদখানা', 'নিরস্ত্রীকরণ কেন', 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালেবিলে', 'পা', 'উদ্বাস্তু', 'আহ্নিকগতি ও মাঝখানের দরজা', 'কলকাতা ও গোপাল' গল্পগুলি তো অ-সাধারণ। মনে পড়ছে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি অসামান্য গল্পের কথা ঃ 'তৃতীয় পুরুষ', 'টেবিলল্যাম্প', 'কর্ণেলের মেয়ে', 'সোফা কামবেড' ইত্যাদি। অন্যধারার গল্পকার তপোবিজয় ঘোষের 'কপাটে করাঘাত', 'সীতানাথের বাজার' প্রভৃতি স্মরণযোগ্য গল্প।

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্যের 'রক্ত গোলাপের চাষ', 'লক্ষ্মীর কথা', ভালো গল্প। বুদ্ধদেব গুহের 'প্রথমাদের জন্য', 'আমরা জোনাকি', 'পাখিরা জানে না', 'লাভ বার্ডস', 'দীপান্তর' ভিন্নমাত্রার ভালো গল্প।

মণি মুখোপাধ্যায়ের 'গণতন্ত্র ও গোপাল কাহার', 'ক্ষেতুবাগ্দীর স্বাধীনতা', 'রতন সান্যালের ব্যাধি ও তার প্রতিকার', 'নিশা সামন্তের বাপের ভূত', 'কুড়োরামের দিব্যজ্ঞান', 'বাদাবাউরীর উপাখ্যান', 'নিজন মুর্মু', 'তদন্ত কমিশন', 'নিয়ান ডার্থাল' প্রভৃতি অসামান্য শক্তিশালী গল্পগুলি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

দিব্যেন্দু পালিতের 'জাতীয় পতাকা', 'ঘুম', 'মানুষের মুখ', 'দুঃসময়', 'মাড়িয়ে যাওয়া', 'দাঁত', 'মুনিয়ার সঙ্গে কিছুক্ষণ' গল্পগুলি এখনো মনের ভেতরে উজ্জ্বল। রমানাথ রায়ের 'ক্ষত', 'ঝাড়লণ্ঠনের তেকোনা কাঁচ', 'হে অরণ্যদেব', 'তোতনের কথা', 'বিশ্রাম', 'বলার আছে' গল্পগুলি অন্য ধরনের। দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাবা মা ও নীলাভর ছবি' গল্পটির কথা মনে পড়ছে। সমীর রক্ষিতের 'বাপটা ছেলেটা', 'খড়্গ', 'বন্যার পরে বাড়ি ফেরা', 'উৎসবের দিকে', 'বেলা অবেলা'; শেখর বসুর 'চোখ', 'গল্প' 'বিবর্তন', 'রূপা কেমন?', 'পাঁচ হাত দূরে', 'মনে হল', 'অন্ধকার থেকে'; বলরাম বসাকের 'সুখটুখ', 'দুঃখ টুঃখ', 'রোপওয়ে', 'সন্দেহশার্দূল', 'বিস্কুটের টিন', 'প্রিয় জিনিস', 'প্রেমিক নাম চরিত', 'কার্পেট' ইত্যাদি ভিন্ন স্বাদের মনে রাখার মতো গল্প।

শঙ্কর সেনগুপ্তের 'অন্যমুখ', 'বিপন্ন বিস্ময়', সমরেশ মজুমদারের 'ইচ্ছে বাড়ি' প্রভৃতি অসামান্য গল্পগুলির কথা অনেকদিন মনে থাকবে। এই খণ্ডের গল্পের সংখ্যা ৩৯। খণ্ডটি শেষ করেছি, এ-কালের বিশেষ জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের গল্প দিয়ে। এই খণ্ডের সময়সীমা ১৯৩৪ থেকে ১৯৪১।

পুনশ্চ ঃ বিশেষ উৎসাহী/আগ্রহী সহৃদয় পাঠকদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি কথা। দশ খণ্ডের 'বাংলার ছোটগল্প' গ্রন্থের **কেবলমাত্র প্রথম খণ্ডেই রয়েছে বাইশ পৃষ্ঠার একটি তথ্যসমৃদ্ধ দীর্ঘ ভূমিকা**। সেখানে আছে বাংলা **গদ্যের সূচনা, গদ্যগ্রন্থ, গদ্য-সাহিত্য, আদি-গল্প, গল্প,** ছোটগল্পের আবির্ভাব ঃ তার জন্ম ও উৎস সন্ধান, সংজ্ঞা ইত্যাদি বিষয়ের উপর দীর্ঘ আলোচনা।

আছে অসংখ্য ছোটগল্পের সৃষ্টির অনিবার্য প্রেরণা হিসেবে অপরিহার্য পটভূমি-সমূহের (ভারতবর্ষের **বহু বিচিত্র সামাজিক পরিস্থিতি, নানা ধরনের** রাজনৈতিক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সংঘাত-সংঘর্ষ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভ, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের নানাবিধ সমস্যা, সংকট ইত্যাদি) তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে বিস্তৃত বিশ্লেষণ।

বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামন্বন্তরে ভেঙে পড়া বাংলার সমাজ-অর্থনীতি, **দেশভাগ, খণ্ডিত** স্বাধীনতা-প্রাপ্তি, **উদ্বাস্তু-স্রোত**; সেই মহা-প্রলয়ের সময়ের জীবন্ত ছবিও (এক-একটি কালজয়ী গল্পের সঙ্গে যে পটভূমির অঙ্গাঙ্গী যোগ) প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আগস্ট-আন্দোলন, ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা তথা **'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'** আর ঠিক তার পরই **তেভাগা আন্দোলন**; পরবর্তীকালে **'নকশাল আন্দোলন', 'জরুরী অবস্থা'**, বারবার বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উত্থান,—এ-সব কিছুই বাংলার গল্পকে দিয়েছে নতুন প্রাণ, তারও **অনুপুঙ্খ** বিশ্লেষণ সেখানে করেছি আমি।

আবার বিভিন্ন সাহিত্য-আন্দোলন (**'কল্লোল', 'শ্রুতি', 'হাংরি জেনারেশন', 'শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলন', 'এই দশক', 'নিম সাহিত্য-আন্দোলন', 'নতুন রীতির গল্প আন্দোলন'** ইত্যাদি); লেখক-পাঠক-সম্পাদক-প্রকাশকের ছোটগল্প ব্যাপারে দায়িত্বহীনতা ও দায়িত্বের কথা; **সর্বোপরি পাঠকের কাছে** সে-কাল ও এ-কালের ছোটগল্পের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের সম্ভাব্য কারণগুলিও বিশ্লেষিত হয়েছে সেই ভূমিকায়।

তাই, উৎসুক শ্রদ্ধেয় পাঠক সেটি একবার দেখে/পড়ে নিলে সম্পাদকের শ্রমের ভার কিছুটা লাঘব হবে।

(ড. বিজিত ঘোষ)

শ্রীরামপুর
বইমেলা ২০০২

সূচীপত্র

প্রফুল্ল রায়	রাজা যায় রাজা আসে	১১
সুরজিৎ দাশগুপ্ত	দুর্গা এল বাপের বাড়ি	২৪
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	উত্তরের ব্যালকনি	৩২
উদয়ন ঘোষ	গোপালের মা স্নেহলতা	৪৪
নিখিলচন্দ্র সরকার	ডুমুর	৫৭
সৈয়দ সামসুল হক	শীতবিকেল	৭০
দেবেশ রায়	সাধারণ চক্কোত্তির জীবনসূত্র	৮১
সমীর মুখোপাধ্যায়	মৃত মানুষের অমৃতকথা	৮৬
জ্যোৎস্নাময় ঘোষ	বৃত্ত	৯৮
তারাপদ রায়	ভি এম স্যার	১০৭
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	শ্বেতপাথরের টেবিল	১১৫
তপোবিজয় ঘোষ	কুণ্ডুবাবুর কুকুর, আমি এবং ভূতনাথ	১২৬
সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য	কুমারী মা	১৩৮
শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়	শিবপুজো	১৪২
বুদ্ধদেব গুহ	মৃত্যুবার্ষিকী	১৪৩
নবনীতা দেবসেন	মাতৃয়ার্কি	১৪৮
রাম রায়	মৃতের খাদ্য	১৬০
হাসান আজিজুল হক	আত্মজা ও একটি করবী গাছ	১৬৩
মণি মুখোপাধ্যায়	থুঃ থুঃ	১৬৯
দিব্যেন্দু পালিত	সম্পাদক	১৭৪
রমানাথ রায়	কিডনি চাই	১৮০
দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	জল	১৮৬
সমীর রক্ষিত	সাদা পায়রা	১৯৪
নৃপেন্দ্রনাথ মহন্ত	পতঙ্গ-বাসনা	২০১
বিশ্বজিৎ চৌধুরী	যেভাবে চুরি হয়ে যায়	২০৯
শুকদেব চট্টোপাধ্যায়	সেদিন পূর্ণিমা রাত	২১৫
শেখর বসু	টাঙ্গি	২৩২
কালী ন[illegible]	ইতিহাসের ধারা	২৩৭
অমল চক্রবর্তী	অনুশাসনীয়	২৪৪
আশিস ঘোষ	বাস স্টপে দাঁড়িয়ে	২৫১
অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত	জ্যোতিপ্রকাশ একা এবং একা	২৫৬

বিপ্রদাশ বড়ুয়া	সাদা কফিন	২৬০
বলরাম বসাক	জঙ্গি আক্রমণ	২৬৬
জীবন সরকার	চালি	২৭৫
শঙ্কর সেনগুপ্ত	টান	২৮৩
অশোককুমার সেনগুপ্ত	কালো দরজা	২৯০
কল্যাণ সেন	লক্ষ্যভেদ	২৯৭
কালীকুমার চক্রবর্তী	দ্বিপাদভূমি	৩০৬
সমরেশ মজুমদার	বেলোয়ারি	৩১৮

রাজা যায় রাজা আসে

প্রফুল্ল রায়

ভোরবেলা পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে গা নাচাচ্ছিল রাজেক। পরনে সবুজ জমির ওপর হলুদ হলুদ রেখ্‌কাটা লুঙ্গি আর জালি গেঞ্জি। এই সাতসকালেই চুলে কাকুই পড়েছে; মাথায় পেখম তুলে টেরি কেটে নিয়েছে সে। তার বুকে এখন সুখের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আজই শুধু? ক'মাস ধরেই সুখের নদীতে বান ডেকে আছে তার।

পুবের ঘর বাদ দিলে উত্তর এবং পশ্চিমের ভিটের বড় বড় পঁচিশের বন্দের দু'খানা ঘর। সেগুলোর মাথায় ঢেউটিনের নক্সা-করা চাল; গায়ে শালকাঠের খিলান-দেওয়া দেয়াল, বিলিতী মাটির পাকা মেজে।

রাজেক যেখানে বসে আছে, তার তলা থেকে ঢালা উঠোন। উঠোনটার একধারে সারি সারি ধানের ডোল, আরেক ধারে শিউলি গাছ। উঠোনের পর খানিকটা নামাল জমি; পিঠক্ষীরা আর সোনালের ঝোপে জায়গাটা ছেয়ে আছে। তারপর পুকুর। পুকুর পেরিয়ে ধানের খেত। বর্ষায় পুকুর এবং ধানখেত ভেসে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এখনও তেমনটিই রয়েছে, দুয়ের মাঝখানে সীমারেখা নেই কোথাও।

এতগুলো বড় বড় টিনের ঘর, প্রকাণ্ড উঠোন, পুকুর, পুকুরের পর একলপ্তে নব্বুই কানি দো-ফসলা জমি—সমস্ত মিলিয়ে রাজা-বাদশার ঐশ্বর্য। আর এ সবই এখন রাজেকের। অথচ আট মাস আগে? আট মাস আগের কথা এখন নয়।

আশ্বিন মাস যায় যায়। সারা বর্ষার জলে ধুয়ে ভাদ্রের গোড়ায় আকাশ সেই যে আশ্চর্য রকমের নীল হয়ে গিয়েছিল, এখনও তা-ই আছে। তার গায়ে থোকা থোকা ভবঘুরে মেঘ। উঠোনের শিউলি গাছটা ফুলে ফুলে সেজে রয়েছে। সেই কবে থেকে, শরৎ আসবার আগেই বুঝি, সারা গায়ে ফুল ফোটাতে শুরু করেছিল গাছটা, এখনও ফুটিয়েই যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে সূর্য উঠে গেল। গলানো সোনার মতো রোদের ঢল নামল চারদিকে। কোত্থেকে দুটো মোহনচূড়া পাখি উত্তরের ঘরের চালে উড়ে এসে ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে খুনসুটি জুড়ে দিল। সামনে-পেছনে, পুবে-পশ্চিমে—যেদিকেই চোখ ফেরানো যায়, শরৎকাল যেন জাদুকরের বেশে দাঁড়িয়ে।

পা নাচাতে নাচাতে অন্যমনস্কের মতো ধানখেতের দিকে তাকিয়ে ছিল রাজেক। ক'মাস ধরে রোজ সকালবেলা এমনিভাবে পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে অলস চোখে তাকিয়ে থাকছে সে। এটা যেন বিলাসের মতো, কিংবা তার মনেরই কোন প্রিয় খেলা।

দূরে, অনেক দূরে ধানখেত চিরে চিরে একটা নৌকো আসছিল। নৌকোটা ঠিক দেখা যাচ্ছিল না। ধানবনের ওপর গোল ছই, একটা কালো কুচকুচে মাঝি আর উঁচু লগির ওঠানামা চোখে পড়ছিল।

রোজ সকালে কত নৌকোই তো ধানখেত ভেঙে কত দিকে চলে যায়। ওই নৌকোটা কোথায় কোনদিকে চলেছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই রাজেকের। চারধারে আশ্বিনের নরম রোদের ছড়াছড়ি, মোহনচূড়া পাখি দুটোর নাচানাচি কিংবা আকাশের ভাসমান মেঘ—কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না সে। রাজেক ভাবছিল—নিজের কথা, নিজের তিরিশ বছরের একটানা দীর্ঘ জীবনটার কথা।

হায় রে, কী জীবন ছিল তার। আজ এই জালি গেঞ্জিটি গায়ে দিয়ে মাথায় শৌখিন টেরিটি কেটে, সুখের নদীতে গা ভাসিয়ে রাজেক পা নাচাচ্ছে, আট মাস আগে তা ছিল অসম্ভব। দেশখানা যদি দু ভাগ না হত, বৈকুণ্ঠ সাহারা যদি এই ছিপতিপুর গ্রাম ছেড়ে চলে না যেত, এত সুখ কপালে ছিল না।

ভাবনাটা পুরো হল না। তার আগেই কি আশ্চর্য, ধানখেতের সেই নৌকোটা পুকুর পাড়ি দিয়ে ঘাটে এসে ভিড়ল।

ভুরু কুঁচকে খাড়া হয়ে বসল রাজেক। ভেবেই পেল না, সকালবেলায় তার কাছে কে আসতে পারে। সে জন্য অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটু পরে নৌকো থেকে যে নামল সে আর কেউ না, স্বয়ং তোরাব আলী—ছিপতিপুর গ্রামের সব চাইতে বড় ধনী গৃহস্থ।

দুশো কানি তেফসলা জমি তোরাব আলীর, হাল-হালুটি অগুনতি, গরু আর বলদ পঞ্চাশ-ষাটটা, নৌকো গোটা চল্লিশেক। পঁচিশ-তিরিশটা কামলা বারো মাসই খাটছে। ধান-পাট-মুগ-মুসুর সব মিলিয়ে এলাহী কাণ্ড। মাস আষ্টেক আগেও তার বাড়ি কামলা খেটেছে রাজেক। এই ছিপতিপুর গ্রামের সে মাথা; সব চাইতে গণ্যমান্য ব্যক্তি।

বড় গৃহস্থই শুধু না, তোরাব আলী মানুষটি ভারি শৌখিনও। এই সকাল-বেলাতেই পরিপাটি সাজসজ্জা করে বেরিয়েছে। পরনে সিল্কের লুঙ্গি, কলিদার পাঞ্জাবি, পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা, চুলে-দাড়িতে কলপ; রাজেক জানে, কাছে গেলে তার চোখে সুর্মার টান দেখতে পাবে, আতরের ভুরভুরে গন্ধ নাকে এসে লাগবে।

তোরাব আলী কি তার কাছেই এসেছে? প্রথমটা বুঝতে পারল না রাজেক। তোরাব আলীর মতো মানুষ তার কাছে আসতে পারে, এর চাইতে বিস্ময়কর ঘটনা জগতে আর বোধহয় কিছু নেই। বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ একভাবে বসে থেকে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়ল রাজেক; তারপর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে পুকুরঘাটে চলে এল। হাত কচলাতে কচলাতে খুব সম্ভ্রমের গলায় বলল, 'আপনে!'

দু-হাতে দাড়ি তোয়াজ করতে করতে সামান্য হাসল তোরাব আলী। বলল, 'হ, আমিই তর কাছে আইলাম—'

হায় আল্লা! শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না রাজেক। প্রতিধ্বনির মতো করে বলল, 'আমার কাছে!'

'হ—হ, তরই কাছে।'

কী উত্তর দেবে, রাজেক ভেবে পেল না।

খুব তরল গলায় তোরাব আলী এবার বলল, পুকৈর (পুকুর) ঘাটেই খাড়া করাইয়া রাখবি নিকি? ঘরে নিয়া যাবি না?'

সুরটা অন্তরঙ্গ। সেই ছোটকাল থেকে তোরাব আলীকে দেখছে রাজেক; এভাবে তাকে কথা বলতে আগে আর কখনও শোনে নি।

যাই হোক, রাজেক খুব লজ্জা পেয়ে গেল। ব্যস্তভাবে বলল, 'আসেন-আসেন—'

বাড়ি এনে তোরাব আলীকে কোথায় বসাবে, কিভাবে আপ্যায়ন করবে, ঠিক করে উঠতে পারল না রাজেক। প্রথমে ছুটে গিয়ে একটা পাটি এনে দাওয়ায় বিছিয়ে দিল। কিন্তু নিজের কাছেই তা মনঃপূত হল না। তক্ষুনি সেটা গুটিয়ে একটা জলচৌকি নিয়ে এল।

তোরাব আলী কিন্তু বসল না। তার সমাদরের জন্য রাজেকের ছোটাছুটি ব্যস্ততা দেখে সে খুব সন্তুষ্ট। প্রসন্ন গলায় বলল, 'আমার লেইগা অস্থির হইস না রাজেক। বসুম পরে। আগে তর ঘরদুয়ার দেখা—'

চমকে সংশয়ের চোখে তোরাব আলীকে একবার দেখে নিল রাজেক। তার বাড়িঘর দেখার জন্যই কি সকালবেলা ছুটে এসেছে লোকটা? তোরাব আলীর মনে কী আছে, কে জানে!

রাজেকের মুখচোখের সন্দিগ্ধ চেহারা দেখে কিছু একটা আন্দাজ করে নিল তোরাব আলী। মৃদু কৌতুকের সুরে বলল, 'ডর নাই, তর বাড়িঘর আমি কাইড়া নিমু না। তর জিনিস তরই থাকব।'

মুখ ফুটে তোরাব আলী একবার যখন দেখতে চেয়েছে তখন আর 'না' বলা যাবে না। মনের ভেতর স্তূপাকার সন্দেহ নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাল রাজেক।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত দেখে জলচৌকির ওপর জাঁকিয়ে বসল তোরাব আলী। বলল, 'তামুক আছে রে?'

খেয়াল করে তামাক-টামাক নিজেরই দেওয়া উচিত ছিল। রাজেক দিতও। কিন্তু সন্দেহে মনটা হঠাৎ মেঘলা হয়ে যাওয়ায় ভুলে গিয়েছিল।

যাই হোক, ছুটে গিয়ে তামাক সেজে নিয়ে এল রাজেক। আয়েশ করে হুঁকো টানতে টানতে তোরাব আলী বলল, 'বৈকুণ্ঠ সা বাড়িঘর তরে দেখাশুনা করতে দিয়া গেছে, না?'

লোকটার উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। প্রায় দম বন্ধ করে রাজেক উত্তর দিল, 'হ'।

সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে তোরাব আলী বলল, 'ঐ পুকৈরও তো বৈকুণ্ঠ সা'র?'

'হ।'

'পুকৈরের ওই পারের জমিন?'

'হেয়াও (তাও) সা' কত্তার।'

'কত জমিন আছে?'

'নব্বই কানি।'

'হগলই (সবই) অখন তর হ্যাফাজতে (হেপাজতে)?'

আবছা গলায় রাজেক বলল, 'হ।'

একটু নীরবতা। দ্রুত বারকতক হুঁকো টেনে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়ল তোরাব আলী। তারপর বলল, 'বৈকুণ্ঠ সা'রা আট মাস আগে গেরাম ছাইড়া গেছে না?'

লোকটা দেখা যাচ্ছে, অনেক খবর রাখে। আগের সুরেই রাজেক বলল, 'হ।'

'কই গেছে জানস?'

'শুনছিলাম কইলকাতার দিকে যাইব।'

'খোঁজখপর কিছু পাইছস?'

'না।'

'এইর ভিত্‌রে তরে চিঠিপত্তর দিছে?'

'না।'

একটু চুপ করে থেকে কপাল কুঁচকে কি ভাবল তোরাব আলী। তারপর বলল, 'তর কী মনে হয়?'

প্রশ্নটা বুঝতে পারল না রাজেক। জিজ্ঞেস করল, 'কোন ব্যাপারে?'

'বৈকুণ্ঠ সা'রা আর ফিরব?'

'কেম্‌নে কমু?'

রাজেকের কথা যেন শুনতে পেল না তোরাব আলী। অনেকটা আপন মনেই বলে উঠল, 'আমার মনে লয় অরা (ওরা) ফিরব না।'

রাজেক উত্তর দিল না।

তোরাব আলী আবার বলল, 'বৈকুণ্ঠ সা'রা না ফিরলে তার জমিন, বাড়িঘর পুকৈর—সগল তর হইয়া যাইব। হইয়া যাইব কি, হইয়া গেছেই।'

রাজেক এবারও চুপ।

বৈকুণ্ঠ সাহা এবং তার বিপুল সম্পত্তি সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরো কিছুক্ষণ খবর-টবর নিল তোরাব আলী। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'এইবার কামের কথাখান সাইরা লই।'

দম বন্ধ করেই ছিল রাজেক। আবছা গলায় বলল, 'কী কাম?'

'আমার ইচ্ছা, কাইল দুফারে (দুপুরে) আমাগো বাড়িত্ চাউরগা (চাট্টি) ডাইল-ভাত খাবি।'

সামনে বাজ পড়লেও এতখানি চমকাত না রাজেক। ছিপতিপুর গ্রামের সব চাইতে বড়, সব চাইতে সম্মানিত, সবচাইতে মর্যাদাসম্পন্ন গৃহস্থ—যার বাড়ি ক'দিন আগেও সে কামলা খেটেছে, সেই তোরাব আলী কিনা নিজে এসে তাকে নেমন্তন্ন করছে। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল রাজেক, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না।

এদিকে হাতের উপর ভর দিয়ে উঠে পড়েছে তোরাব আলী। বলল, 'তাহলে ঐ কথাই রইল। কাইল দুফারে আসবি কইলাম।'

সজ্ঞানে না, অনেকটা ঘোরের মধ্যেই যেন ঘাড় কাত করল রাজেক।

তোরাব আলী বলল, 'আবার ভুইলা যাইস না। আমরা কিন্তুক তর লেইগা বইসা থাকুম।' বলে আর দাঁড়াল না। সামনের ঢালা উঠোন, তারপরের সোনাল আর পিঠক্ষীরা গাছের জঙ্গল পেরিয়ে পুকুরঘাটে চলে গেল। একটু পর তার নৌকো দূর ধানখেতের ভেতরে অদৃশ্য হল।

তোরাব আলী চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ একইভাবে বসে থাকল রাজেক। পুকুরঘাট পর্যন্ত যে তাকে এগিয়ে দিয়ে আসা উচিত ছিল, এই কথাটা রাজেকের একবারও মনে পড়ে নি। আসলে এত বিস্মিত, এত স্তম্ভিত, এত বিহ্বল আগে আর কখনও হয় নি সে। এমন ভয়ও কখনও পায় নি।

তোরাব আলী তার কাছে এসেছিল, কাল দুপুরবেলা খাবার জন্য নেমন্তন্ন করে গেছে—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন অবিশ্বাস্য। তোরাব আলীর মতো মানুষ তার কাছে আসতে পারে, শুধু আসাই না, এত খাতির করতে পারে—এমন ঘটনা ভাবাই যায় না। আজ না হয় বৈকুণ্ঠ সাহারা দেশ ছেড়ে যাবার পর একটু সুখের মুখ দেখেছে। নইলে আট মাস আগেও তার দিন যে কিভাবে চলত!

আশ্বিনের এই সকালে বিমূঢ়ের মতো পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ সময়ের উজান ঠেলে পেছন ফিরে গেল রাজেক।

হায় রে, কী জীবন ছিল রাজেকের। ছোটকালেই তো বাপ-মা খেয়ে বসেছে। তারপর থেকে দু গরাস ভাতের জন্য কুকুরছানার মতো ছিপতিপুরের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াত। কখনও যেত মৃধাদের বাড়ি, কখনও সর্দারদের, কখনও বা খাঁয়েদের। তবে সব চাইতে বেশি যেত হিন্দু পাড়ায়। কোথাও কিছু জুটত, কোথাও আবার কিছুই না। খিদে ছাড়া সে সময় আর কোন অনুভূতি ছিল না; সর্বক্ষণ খিদেটা তার পায়ে পায়ে ফিরত।

একটু বড় হবার পর রাজেকের মনে হয়েছিল, অন্যের করুণার ওপর চিরকাল বাঁচা যায় না; আর তা সম্মানজনকও না। কাজেই খানিকটা টোন সুতো আর বঁড়শি যোগাড় করেছিল সে। লোকের বাড়ি থেকে চেয়েচিন্তে এনেছিল খানদুই মুলি বাঁশ। বাঁশ চিরে চিরে 'পোলো' এবং 'চাই' বানিয়েছিল আর বুনে নিয়েছিল একখানা 'ধর্মজাল'। তখন থেকে কঠিন জীবন-সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছিল তার।

এ দেশে সারা বছরই জল। খাল শুকোয় তো বিল আছে, বিল শুকোয় তো গাঙ তার বুক ভরে রেখেছে। বঁড়শি নিয়ে, ধর্মজাল নিয়ে, পোলো নিয়ে খাল-বিল কি দু-মাইল দূরের বড় নদীতে চলে যেত রাজেক। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একটানা পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ যে মাছ মিলত তাই নিয়ে সে ছুটত সুনামগঞ্জের হাটে। মাছ বেচে সন্ধ্যের পর ছিপতিপুরের এক কোণে যে গরীব মুসলমান পল্লীটা আছে সেখানে চলে যেত। ওদের রান্নাবান্না হয়ে গেলে কারো উনুনে চাট্টি ফুটিয়ে নিত। তারপর খেয়েদেয়ে তাদেরই ঘরের দাওয়ায় টান হয়ে শুয়ে পড়ত।

সারাটা বছর জলে-জলেই কেটে যেত রাজেকের। ফাঁকে ফাঁকে সময় পেলে লোকের বাড়ি কামলা খাটত। এর ধান কেটে দিত, ওর পাট 'তুলে' দিত। বেশির ভাগ সময় সে খাটত তোরাব আলীর কাছে। পৌষ মাঘ মাসে ধান উঠে গেলে মাঠে যে শস্যের দানাগুলো কৃষাণদের চোখ এড়িয়ে পড়ে থাকত সেগুলো খুঁটে খুঁটে তুলে আনত রাজেক, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ইঁদুরের গর্ত থেকে ধান বের করত। কুড়নো ফসল থেকে এক-আধটা মাস ভালই কেটে যেত।

জলে-স্থলে সারা বছরই তার নিদারুণ জীবন-সংগ্রাম। ডাঙায় অবশ্য বেশিদিন থাকতে পেত না রাজেক। প্রায় বারো মাস জলে ভিজে ভিজে চামড়া ফেটে ফেটে গিয়েছিল; গা থেকে সর্বক্ষণ খই উড়ত। চুল-দাড়িতে জট পাকিয়ে গিয়েছিল; চোখ দুটো থাকত ঘোলাটে হয়ে। নখের কোণে পাঁক ঢুকে 'কুনি' হয়েছিল। হেজে হেজে আঙুলের ফাঁকে থকথকে ঘা। রাজেকের চোখের সামনে দিনরাতের একটাই মোটে রঙ তখন। তার নাম দুঃখ, অসীম অন্তহীন দুঃখ।

হায় রে, কী জীবন ছিল রাজেকের!

শীত-গ্রীষ্ম, শরৎ-হেমন্ত—ঋতুর চাকায় পাক খেয়ে খেয়ে তিরিশটা বছর কিভাবে কেটে গেছে, রাজেক জানে না।

একদিন সকালবেলা এক কোমর স্রোতে নেমে ধর্মজাল বাইতে বাইতে হঠাৎ তার চোখে পড়েছিল, স্কুলবাড়ির সামনের বড় মাঠটায় কাতারে কাতারে মানুষ গিয়ে জমা হয়েছে। চিত্রবিচিত্র পোশাক-পরা একদল লোক বিলিতী বাজনা বাজাল; কারা যেন গলার শির ফুলিয়ে ফুলিয়ে, প্রচুর মাথা নেড়ে বক্তৃতা করল; সিল্কের নতুন পতাকা উঠল আকাশের দিকে।

সকালবেলা বর্ণশূন্য ধূসর চোখে স্কুলবাড়ির মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিল রাজেক। সন্ধ্যের পর ওখানেই যখন বাজি পোড়াবার ধুম পড়ে গেল তখন আর দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে শুধিয়েছিল, 'এত রং-তামাশা ক্যান? বাজি ফুটানের হইল কী?'